কবির নির্বাসন

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

এক ফাযনী পূর্ণিমার রাতে কবি বনমালীকে স্বীয় রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলেন রাজা অক্ষয়চন্দ্র। কবি হিসেবে বনমালী অবশ্যই খুবই বড়ো কিন্তু তাঁর দোষ ছিল অন্যত্র। বনমালীর কাছে কবিতার পাঠ নিতে যেতেন রাজকন্যা মাধবী। মাধবীর যৌবন এবং রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে প্রৌঢ় বনমালী সহসা ভয়ংকর প্রণয়মূলক কবিতা লিখতে শুরু করেন। লোকলজ্জার ভয়ে প্রথম প্রথম সেসব তিনি প্রকাশ করেননি। ক্রমশ এই স্পর্ধা তাঁর বেড়েই যায়। এবং অবশেষে তিনি মাধবীর উদ্দেশে এমনই মর্মান্তিক, রহস্যময় কবিতা লিখতে শুরু করেন যে মাধবী নিজেও ভারি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। যথাকালে বনমালীর নামে রাজসভায় নালিশ করে ভবতোষ। শোনা যায় ভবতোষের একগুচ্ছ কবিতা একবার বনমালী ‘পক্ষীর বিষ্ঠা’ বলে মাটিতে নিক্ষেপ করেছিলেন। আমার নিজেরও ধারণা ভবতোষ অত্যন্ত নারকীয় কবিতা লেখে। ওরই এক কবিতা পাঠের আসরে হৃদকম্প শুরু হয়েছিল কবি ফণিভূষণের। আমাদের ভরতপুর রাজ্যে অনেকের ধারণা কবিকুলমণি শ্রীভতৃহরির পর ফণিভূষণের মতো বড়ো কবি আর জন্মাননি। তবে

বনমালীর মতো ফণিভূষণ প্রত্যক্ষ বচনে ভবতোষের নিন্দে কখনো করেননি, কারণ রাজপ্রাসাদে ভবতোষের যাতায়াত বড্ড বেশি। স্বয়ং অক্ষয়চন্দ্র এবং তাঁর সমুদয় অমাত্যেরা ভবতোষকে বিশেষ স্নেহ করেন।

কবিতা লেখা লেখার সঙ্গে সঙ্গে সে কবিকুলের তথা পন্ডিত সমাজের খবরাখবর তাঁদের কানে পৌঁছে দেয়। অনেকের ধারণা কবিতার চেয়ে চরবৃত্তিতে ভবতোষের মেধা অধিক।

যাই হোক, এই ভবতোষ কিন্তু বনমালী সম্পর্কে একটা অদ্ভুত খবর সভায় রটাল। বনমালী নাকি পূর্ণচন্দ্র রাত্রিতে উলঙ্গ হয়ে বৈরাগী নদীতে এক বুক জলে দাঁড়িয়ে মাধবীর উদ্দেশে তাঁর অশ্লীল কবিতা আবৃত্তি করেন। তারপর... তারপর জল থেকে উঠে পাড়ের এক গাছকে মাধবীজ্ঞানে রমন, মর্দন এবং ধর্ষণ করেন। পূর্ণিমার রাত্রির পর যে ভোর হয় তখন বলমালীকে ছিন্নভিন্ন অবস্থায় বৈরাগীর তীরে পাওয়া যায়। বেশ কিছু কাল ধরেই নাকি বনমালী তাঁর পূর্ণিমাযাপন ওইভাবেই করে থাকেন।

এই খবর প্রথম শুনে রাজা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কন্যাকে এত সম্ভোগের দৃষ্টিতে দেখে এক প্রজা কবি! তিনি বহুক্ষণ পর তাঁর মানসিক স্থৈর্য উদ্ধার করে বনমালীকে ডেকে পাঠাতে নির্দেশ দিলেন। একই সময়ে তিনি ডেকে পাঠালেন মাধবীকেও। মাধবী কবির এই পূর্ণিমার ব্যাপার-স্যাপার জানত না। বনমালীর কবিতায় সে যে অন্তরে অন্তরে পুলকিত হত সে তো বলাই বাহুল্য। শেষ দিকের বাড়াবাড়িতে, বিশেষত কবিতায় তার নগ্ন বর্ণনায় সে যে অপ্রস্তুত হয়নি তা নয়, কিন্তু মাধবী জানত বনমালী অবশ্যই বড়ো কবি। তাই তাঁর শব্দ-বর্ণ চিন্তা দোষও মার্জনীয়। কোনো খারাপ কবি ওইসব লিখলে মাধবী অবশ্যই তাকে জুতোপটা করত। নিজে একটু-আধটু কবিতা চর্চা শুরু করে মাধবী জানতে পেরেছে দেশে সত্যিকারের কবি মাত্র

বনমালী! অন্য সব কটিই হাতুড়ে। এমনকী যে ফণিভূষণকে রাজ্যের সবাই শ্রীভতৃহরির পর সবচেয়ে বড়ো পদাকার মনে করে তিনি আসলে অতিনিকৃষ্ট। ভরতপুরে ইদানীং সংস্কৃত ভাষা কিংবা পান্ডিত্যের চল খুব কম। রাজ্যের অধিকাংশ লোকই প্রায় মূখ। তারা এর-তার মুখে ঝাল খায়। তাদের যে যা বোঝায় তাই বোঝে। মাধবী এও জানে যে, রাজ্যের অন্যতম প্রধান মূখ তার পিতা অক্ষয়চন্দ্র নিজে।

বেগতিক দেখে মাধবী বনমালীর প্রাণ বাঁচানোর এক অভিনব পথ অবলম্বন করল। রাজসভার হাওয়া গরম দেখে সে টের পেয়েছিল অনুনয়-বিনয় করে বনমালীর প্রাণ বাঁচানো যাবে না। সে তখন তারস্বরে ঘোষণা করল, রাজন! এই পাপী লোভী কামুক দুর্বিনীত নিকৃষ্ট কবিকে হত্যা করাও হাত গন্ধ করা। আমি এর কাছে কবিতা শিক্ষা করতে গিয়ে টের পেয়েছি এই কবি এক অতিকায় ভন্ড। এর দুরূহ ছন্দজ্ঞান আছে ঠিকই, কিন্তু কাব্যভাব বিন্দুমাত্র নেই। আমি অবলা নারী সহসা এর চাতুরীর মর্মোদ্ধার করতে পারিনি। এতকাল ধরে তাই এত এত সময় নষ্ট করেছি। হায়! হায়! কিন্তু রাজন! আর বেশিদিন এর শিক্ষানবিশি করলে আমি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যেতাম। পরমপিতা ভগবান আমায় বাঁচিয়েছেন। এখন আমার ইচ্ছে তাই যে, এই আশ্চর্য শঠ মানুষটিকে কালবিলম্ব না করে উজ্জয়িনীতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। উজ্জয়িনীর সঙ্গে এই রাজ্যের সাংস্কৃতিক শত্রুতা বহুদিনের। আমরা এখন অবধি একজন কালিদাস সৃষ্টি করতে পারিনি। কিন্তু উজ্জয়িনীও যাতে আর কোনো দিন কোনো কালিদাস সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্য এই বনমালীকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। এইরকম কোনো কবি যেকোনো সাহিত্যের মূলে অভাবনীয় কুঠারাঘাত করতে পারে। রাজন! এই প্রার্থনা।

মাধবীর এই বাগ্মিতায় সভায় অনেকের চোখে জল এসে গিয়েছিল। স্বয়ং বনমালীই

কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ় হয়ে গেলেন। তাঁর ধারণা হল তিনি অতিঅবশ্যই এক সাংঘাতিক ক্ষতিকারক কবি। এবং এই ধারণার বশে তিনি সভার মধ্যে চেঁচিয়ে ঘোষণা করলেন, রাজন! এই কন্যা অতিসত্য কথা বলেছেন। আমার মতন কবিকে নির্বাসন দেওয়া গুরু পাপে লঘু দন্ড। আমাকে বরং আপনি পাগলা কুকুর দিয়ে খাওয়ান।

সঙ্গে সঙ্গে বনমালীর চেয়ে তীব্রতর কণ্ঠে আপত্তি জানালেন মাধবী। না না রাজন! আপনি ওই শঠের শাঠ্যে ভুলবেন না। ও ওই মৃত্যুর মাধ্যমে সামাজিক লাঞ্ছনা এড়াতে চায়। এতকাল আমাদের বোকা বানানোর শাস্তি ওকে দিতে পারেন উজ্জয়িনীর পন্ডিতেরা। যাঁরা ওর কাব্যকে অশ্বহ্রেষা বলে প্রমাণ করে দেবেন। রাজন! আপনি ওর চাতুরীতে বিপথগামী হবেন না।

কন্যার বুদ্ধির দাপটে একেবারে বিগলিত হয়ে গিয়েছিলেন রাজা অক্ষয়চন্দ্র। তিনি বেশ তাচ্ছিল্যের হাসি ছড়িয়ে বনমালীকে বললেন, তুমি চাইলেই আমরা তোমাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াব? আমাদের তুমি এতই নিরেট ঠাওরেছ বুঝি! তোমার যা দোষ তাতে তো তোমাকে নির্বাসন ছাড়া কিছুই দেব না। তোমার কবি সম্মানের অপর্যাপ্ত ক্ষতি হবে তাতে। লোকে জানবে তুমি আসলে কোনো কবিই নও। তুমি কালিদাসের মতো কবি হলে তোমাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াতাম। তাতে অন্তত আমার সান্ত্বনা থাকত যে, একজন কবিশ্রেষ্ঠকে আমি হত্যা করলাম। কবির খ্যাতির সঙ্গে আমার নামও বিজড়িত হত। কিন্তু তুমি তো ভন্ড। তোমাকে হেনস্থা করা দরকার।

মাধবীর ফন্দিই জিতল সেদিন। বনমালীকে চিরকালের মতন নির্বাসন দিল ভরতপুর। ফাযনী পূর্ণিমার উজ্জ্বল রাত্রিতে বনমালী তাঁর বগলে সামান্য কিছু বইপত্র এবং পরিধেয় বস্ত্র নিয়ে উজ্জয়িনী অভিমুখে রওনা হলেন। যাওয়ার আগে তিনি শেষবারের মতন একবার বৈরাগী নদীর ধারে এসে দাঁড়ালেন।

পূর্ণচন্দ্রের প্রতিফলনে যখন বৈরাগীর জল মৃৎপাত্রে গলিত রুপোর মতন দেখাচ্ছে, নিজের একটা কবিতা উচ্চারণ করতে করতে তিনি তাঁর প্রিয় পরিচিত বৃক্ষটিকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হলেন। এবং অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করলেন যে-গাছটি সে জায়গায় আর নেই!

কাহিনির এই অংশেই আমার, অর্থাৎ শৌনক দত্তের আবির্ভাব। আমি বাল্যবয়স থেকেই কবি বনমালীর অন্ধ ভক্ত। আমি কবিতা বিশেষ লিখতে পারি না, কিন্তু পড়ি অনেক। আমার পিতা শিবদত্ত রাজার অমাত্যদের একজন বলে আমি বরাবরই রাজকন্যা মাধবীর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছি। আমি নিজের চোখে দেখেছি কবি বনমালীর কাছে পাঠ নিয়ে

মাধবী নিজের কাব্যচর্চার কতখানি উৎকর্ষসাধন করেছে। আমি সেই মাধবীর নির্দেশে কবি ধর্ষিত গাছটিকে যতদূর সম্ভব অবিকৃত অবস্থায় কাটিয়ে নিয়ে মাধবীর কক্ষে রেখে এসেছি। মূর্তিকার চন্দ্রভানু সেই কাঠ দিয়ে মাধবীর একটা মূর্তি তৈরির কাজ শুরু করেছে এবং আমার এখনকার কাজ বনমালীর পাশে বসে মাধবীর কবিতার শেষ শিক্ষাটুকু লিখে আনা।

বনমালী যখন তাঁর প্রিয় গাছটির অন্তর্ধানের রহস্য হাতড়াচ্ছেন মনে মনে, আমি অন্য এক গাছের পিছন থেকে সরে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। করজোড়ে ভক্তি নিবেদন করে রাজকন্যার বাসনা তাঁকে জানালাম। সমস্ত শুনে স্মিত হেসে কবি বললেন, কবিতা? মাধবীকে জানিয়ে কবিতার শেষ এক গোলকধাঁধায়। যাতে প্রবেশ এবং যার থেকে নিষ্ক্রমণের পথও কবিতা। এই গোলকধাঁধার বিভিন্ন পথ উপপথ হল আকাশ নদী গাছ চন্দ্র সূর্য তারকা এবং মানুষের জীবনের মহাবিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত। এই গোলকধাঁধায় প্রবেশের সঙ্গী নারী এবং নিষ্ক্রমণের সারথি ঈশ্বর। কারও কারও মতে গোটা

গোলকধাঁধায় প্রবেশটুকুর রহস্যই জানি। নিষ্ক্রমণের পথ তো আমার জানা নেই।

এই তত্ত্ব আমি যখন মাধবীকে জানালাম তা শুনে মাধবী প্রথমে স্তম্ভিত হল এবং পরে অবিশ্রান্তভাবে কাঁদতে থাকল। তাঁর এতকালের কবিতা চর্চায় সে বৃক্ষের রহস্য কিছুমাত্র জানতে পারেনি। তাহলে কবিতার সিদ্ধি তার আর কতদিনে হবে? কবিতার উপকণ্ঠেও যে গিয়ে উঠতে পারেনি সে আর কবে কবিতায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে? পারতপক্ষে সেদিন থেকেই মাধবী অন্নজল ত্যাগ করল। তার একমাত্র দাবি কবি বনমালীকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। এবং তা সে যেকোনো পন্থায়।

প্রবীণ কবি ফণিভূষণ বোঝাতে এলেন রাজকন্যাকে। বললেন, কবিতা মানেই ছন্দ, অলংকার, নিপুণ বাক্যবন্ধ, আশ্চর্য কল্পনার এক প্রতীক। গোলকধাঁধার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এবং নারী দেহের বর্ণনা তাতে কম থাকাই বাঞ্ছনীয়। তাতে আবালবৃদ্ধবনিতাই তার রস গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। কবির কথাবার্তা শেষ হতেই রাজকন্যা বলল, দূর হ পোড়ারমুখো! তুমি হাতুড়ে কবিও নও। তুমি সাপুড়ে।

এর মধ্যে একদিন রাজকন্যা সজোরে কোমরে লাথি মারল ভবতোষকে। মেয়ের মন রাখতে তখন রাজা নিজেও তাঁর চটিজুতো দিয়ে কয়েক ঘা মারলেন। বড়ো কথা, মেয়ের ব্যাপার-স্যাপার বুঝতে জীবনে এই প্রথম কবি কালিদাসের পাশাপাশি বনমালীর কিছু কবিতা পাঠ করলেন। এবং অচিরেই আবিষ্কার করলেন তিনি কী নিদারুণ প্রমাদ ঘটিয়ে বসেছেন। তাঁর অচর্চিত সাহিত্যজ্ঞান এবং সাহিত্যবুদ্ধি দিয়েও রাজা বুঝলেন বনমালী বড়ো আশ্চর্য

প্রতিভার মানুষ। চতুর্দিকে লোক ছোটালেন বনমালীকে সসম্মানে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু কোথাও তাঁকে খুঁজে পেলেন না। এমনকী উজ্জয়িনীতেও না।

উজ্জয়িনীর রসিকসমাজও বনমালীকে পাওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে দেখা গেল। কিন্তু তাঁরাও কোনো খোঁজ পান না। আমরা ধীরে ধীরে বুঝতে শিখলাম গোটা জগৎটাই একটা মস্ত গোলকধাঁধা। কোথায় এর প্রবেশ দ্বার, কোথায় বেরুবার পথ তা কেউ জানে না।

দিনের পর দিন যায় কিন্তু মাধবী অন্নজল বিশেষ স্পর্শ করে না। যদি কখনো ইচ্ছে হয় তো গুটিকয়েক ফলমূল মুখে দেয়। কিন্তু সে-ইচ্ছাও তার বিশেষ একটা হয় না। মাঝে-মধ্যে খড়ি দিয়ে ঘরের মেঝেতে দু-টি চারটি কীসব লেখে। তারপর নিজের চোখের জল দিয়েই সব ধুইয়ে দেয়। সাদা কাপড়ে ঢাকা সাগরের ফেনার মতো গায়ের রং। এক অদ্ভুত বৈধব্যের ভাব আসে মাধবীর চেহারা থেকে। আমি শেষকালে আর অশ্রুসংবরণ করতে পারলাম না। মায়ের অনুমতি নিয়ে বনমালীর খোঁজে বেরুলাম উত্তরের দিকে।

উত্তরের পাঠ শেষ করে একদিন দক্ষিণে গেলাম। তারপর একবার পূর্বে, একবার পশ্চিমে। তারপর ঘুরতে ঘুরতে একসময় ভরতপুরেই এসে উপস্থিত হলাম। গত চার বছরে রাজ্যের বহু কিছু বদলেছে। ইতিমধ্যে দেহ রেখেছেন আমার স্বজাতির অনেকেই। আমার কথা ভেবে ভেবে মা শয্যাশায়ী। বিবাহিতা বোনই এসে এসে তাঁকে দেখে যায়। আমার পিতা আমার উপর ক্ষুব্ধ। তিনি আমার সঙ্গে বাক্যালাপই করলেন না। আমাকে চিনতে পারল না স্বয়ং মাধবীও।

রাগে-দুঃখে আমি আবার দেশত্যাগ করলাম। এবার আর বনমালীর সন্ধানে নয়, নিজের দৃপ্ত যৌবনের সমুদয় আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য। এবং মাসান্তে উপস্থিত হলাম শ্রাবন্তীর এক পানশালায়। দেহের সমস্ত কোষ আমার তখন মদের স্পর্শ, নারীর স্পর্শ চাইছে। আমি সবচেয়ে বড়ো পাত্রের, সর্বাধিক মূল্যের মদ হাতে নিয়ে ক্রমশ অন্ধকারে বারবধূ চিত্রাঙ্গিনীর ঘরের দিকে

এগোলাম। শ্রাবন্তীতে চিত্রাঙ্গিনীর বিপুল খ্যাতি। তার রূপের, বাক্যালাপের এবং রঞ্জকতা গুণের কথা মানুষের মুখে মুখে। সবাই তাকে স্নেহ করে চিত্রা বলে ডাকে। আমি কড়া নাড়তেই সে নিজের দ্বার খুলে দিল। আমি সেই রাত্রের মতো তার সঙ্গকামী জেনেও সে কিছুতেই আমায় নিতে চাইল না। অবশেষে অনেক অনুরোধের পর হাতের মদটুকু আমাকে তার ঘরে বসে শেষ করার অনুমতি দিল। আমি ঘরের আবছা আলোয় মদে জল মেশাতে গিয়ে খেয়াল করলাম চিত্রার বিছানার ওপর হাতে পানপাত্র নিয়ে তুরীয় আনন্দে বসে আছেন কবি বনমালী!

প্রথম প্রথম তো আমাকে চিনতেই চান না বনমালী। অনেক বুঝিয়ে-কয়ে যখন তাঁকে সুস্থির করা গেল তিনি বললেন, আমি তো কবিতার কিছুই জানি না! আমি জানতাম কোনো কবি নারীকে সঙ্গে করে কবিতায় প্রবেশ করে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে সেই পরিবেশ থেকে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু দেশত্যাগ করার পর এই শ্রাবন্তীনগরে আমার সঙ্গে পরিচয় হয় কবি পুরন্দরদাসের। তিনি একুশ বছর মুনি মহাদিত্যের আশ্রমে বৈদিক কবিতাচর্চা করেছিলেন। তিনি নিজেও ছিলেন অতি উৎকৃষ্ট কবি। কিন্তু তিনি কেবল ঈশ্বরকে নিয়ে কবিতা লিখতেন। যার গভীর তত্ত্ব খুব কম লোকই বুঝে উঠতে পারত। এবং আশ্চর্য! এই পুরন্দরদাস কিন্তু ভিখারির মতন মা সরস্বতীর কাছে বাঞ্ছা করতেন নারী সংক্রান্ত কবিতা লেখার কৌশল। শেষে একদিন তিনি আশ্রম ত্যাগ করে শ্রাবন্তীর এই রঙ্গিনীর কাছে এসে কাম মাহাত্মের অভিজ্ঞান প্রার্থনা করলেন! দেশত্যাগের মর্মাতনায় আমিও তখন চিত্রার ঘরে। আমাদের অর্থ সম্বল নিতান্তই সামান্য। আমরা নিজের নিজের কবিতা পাঠ করে চিত্রার অঙ্গসুখের মূল্য দিলাম। এবং প্রত্যুষের আলোর আভায় আমরা একে অন্যকে নিজের কবিতা শোনালাম।

এতক্ষণ কথা বলতে বলতে রীতিমতো শিহরিত, কিছুটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন বনমালী। এবার আমার হাত চেপে ধরে বললেন, শৌনক! দু-জনের কবিতার মধ্যে আমরা দু-জনেরই কবিতার পরিণতি দেখলাম। আধ্যাত্মিক কবি পুরন্দরদাস দেখলেন তাঁর ঈপ্সিত কবিতার মূর্তি আমার কাব্যে। রূপলাবণ্য এবং প্রকৃতির কবি আমি আমার শেষ দেখলাম তাঁর কবিতায়। আমরা বুঝলুম আমরা কেউই তৃপ্ত নই, কেউই পূর্ণ নই। আমরা কবিতার গোলকধাঁধার দুই ভিন্ন পথ ধরে তার মধ্যবিন্দুতে এসে যথার্থই দিশেহারা!

সেদিন দু-জন দুজনকে ধরে সারাটা সকাল কাঁদলাম। আমাদের ঘোর ভাঙল যখন তিতিবিরক্ত চিত্রা এক কলস জল আমাদের মাথায় ঢেলে দিল।

সেই থেকে আমি আর কবিতা লিখি না। কিন্তু হায়! মূর্খ পুরন্দরদাস এখনও তাঁর প্রণয়ী কবিতা রচনা করে চলেছেন। আমি আজকাল শেঠ বানারসী দাসের ব্যাবসার খাতা লিখে জীবিকা অর্জন করি। পুরন্দরদাস তাঁর কবিতার পাশাপাশি শ্রাবন্তীর স্বনামধন্যা গণিকাদের জীবনী এবং এই দেশের গণিকাবৃত্তির ইতিহাস লিখে প্রভূত আয় করে যাচ্ছেন। আমার ধারণা তিনি ভাবী কালের কাছে অমর হয়ে থাকবেন তাঁর এই গবেষণার জন্য। তাঁর কবিতা সবাই ভুলে যাবে।

কিন্তু আমি শৌনক দত্ত অতীব নাছোড়বান্দা। আমি জেদ ধরলাম মাধবীর প্রাণরক্ষার্থে বনমালীকে একবার অন্তত ভরতপুরে ফিরে যেতে হবে। এবং ততোধিক কৃতসংকল্প দেখলাম কবি বনমালীও। যে রাজ্য তাকে নির্বাসিত করেছে সে রাজ্যে তিনি কিছুতেই পা রাখবেন না। আমার কাতর মিনতি শুনে চিত্রাও অশ্রুসিক্তা হল। সেও মিনতি করল কেবল একবারের জন্য বনমালীকে দেশে ফিরতে। কিন্তু কে কার কথা শোনে!

আমি তিনদিন চিত্রার আতিথ্য গ্রহণ করে শেষে দেশে ফিরলাম পুরন্দরদাসকে সঙ্গে নিয়ে। পুরন্দরদাস মাধবীকে মুগ্ধ করার মধ্যে নিজের প্রেমের কবিতার সার্থকতার সম্ভাবনা দেখলেন। আমি তাঁকে বোঝালাম মাধবীর অনুমোদন পাওয়াই কোনো প্রেমের কবিতার উত্তীর্ণ হওয়ার লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া যাবে। এইরকম নানান তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে আরেক ফাযনী পূর্ণিমার রাত্রে আমরা দু-জন বৈরাগীর তীরে এসে উপনীত হলাম। আমি গোটা পরিবেশটাকে বনমালীর কবিতার অনুপ্রেরণা বলে ব্যাখ্যা করলাম। পূর্ণিমার রাতে বৈরাগীর রূপ দেখে ভাবাবিষ্ট পুরন্দরদাস তাঁর প্রেমের কবিতা উচ্চৈঃস্বরে আবৃতি করতে লাগলেন। জলে প্রতিফলিত পূর্ণচন্দ্রের মাধুর্যের সঙ্গে তাঁর কবিতার লালিত্য একাকার হয়ে যেতে থাকল। আমরা কবিতায় এবং প্রকৃতির স্নিগ্ধতায় অবগাহন করে একটা রাত কাটিয়ে দিলাম। ভোরের আলোয় আবার হঠাৎ একটা খেয়াল হল যে, যে গাছটির সঙ্গে কবি বনমালীর অজস্র প্রণয় ছিল, এবং যেটিকে মাধবীর নির্দেশে বহুদিন আগে আমি সমূলে উৎপাটিত করেছিলাম ঠিক সেখানেই একটা শুচিস্মিতা মাধবীলতা জেগে উঠেছে। সেই লতার সর্বাঙ্গে ভোরের শিশির ভিড় করে এসে জমেছে।

আমি এবং কবি যখন প্রাসাদে মাধবীর কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে, আমাদের কানে এল মাধবীর অস্ফুট কন্ঠে বেদ গানের মতন কিছু একটা। আমি দ্বারে আঘাত করে ডাকলাম, মাধবী! দ্বার খোলো। আমি তোমার জন্য কবিকে এনেছি।

বহুক্ষণ পার হয়ে গেল কিন্তু মাধবী দ্বার খোলে না। আমি তখন বাগানের দিকে মাধবীর ঘরের যে জানালা আছে সেইদিকে নিয়ে গেলাম কবিকে। বাগানে তখন ফাযনের ফুলের ঐশ্বর্য। সূর্যের কিরণে কবি পুরন্দরদাসকে সাক্ষাৎ কোনো দেবদূতের মতোন ঠাওর হচ্ছে। গায়ে তাঁর গৈরিক বসন, যাতে বৈরাগ্যের চেয়ে ধর্মের আভাই বেশি। তাঁর অত্যুজ্জ্বল চক্ষু, উন্নত শির,

তীক্ষ্ণ নাসিকা এবং স্পন্দমান ওষ্ঠ পৌরুষের সমস্ত আবেগকে যেন জীবন্ত করে তুলেছে। ক্ষণিকের জন্য আমার মনে হল পুরন্দরদাস বুঝি কোনো নাটকের চরিত্র, লিখিত পৃষ্ঠার থেকে উৎসারিত হয়ে দেহধারণ করে আজ এইখানে। আমি আবার সজোরে ডাকলাম, মাধবী!

নিজের মাধবী ডাকে নিজেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। দেখিনি কখন মাধবী এসে জানালায় দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সে চেয়ে আছে অনন্তের দিকে, আমাদের দিকে তার নজর নেই। আমি বললাম, মাধবী! আমি তোমার জন্য কবি এনেছি। কবিতায় এঁর সিদ্ধি কবি বনমালীর চেয়েও বেশি। ইনি তোমার জন্য কবিতা লিখেছেন, তুমি শুনবে?

হারানো সখাকে খুঁজে পেলে মানুষের মনে যে ভীষণ বিস্ময় এবং আনন্দের উদ্ভাস হয় ঠিক সেই রকম কিছু ঘটে গেল মাধবীর মধ্যে। সে শিশুর মতন বেণী আকর্ষণ করতে করতে বলল, এ তুমি কী দারুণ কথা শোনালে শৌনক! তুমি এখনই কবিকে নিয়ে এসো আমার কক্ষে। আমার তো দৃষ্টি শক্তি আর নেই, আমি ওঁর কবিতার মাধ্যমে চিনে নেব আমার পুরোনো জগৎকে। তুমি এক্ষুনি নিয়ে এসো ওঁকে।

আমার বুকের মধ্যে রক্ত সহসা হিম হয়ে গেল। নিরন্তর অনাহার এবং অশ্রুপাতে মাধবীর চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। আমি ওর সামনাসামনি এসে বললাম, তুমি নিজের একী সর্বনাশ করেছ মাধবী? তুমি কবিতার জন্য নিজের সব খুইয়ে দিলে?

মাধবী ম্লানভাবে হাসল। বলল, কবিতা তো কখনো কিছু দেয় না। যেটুকু তুমি সাধনা করে কবিতার থেকে নিতে পার তার অনেক বেশি কবিতাই

তোমার থেকে নিয়ে নেয়। কিন্তু সে কথা যাক। আমি কবিতা শুনতে চাই। কবি পুরন্দর, আপনি আপনার কবিতা শোনান।

মাধবীর উপস্থিতিতে কীরকম আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন পুরন্দর দাস। তিনি বিনয়ী কণ্ঠে বললেন, আমি জীবনের অধিকাংশ সময় আধ্যাত্মিক কবিতাই লিখেছি। প্রেমের কবিতা ক বছর মাত্র। যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে আপনি ক্ষমা করে দেবেন।

এর পর কবি পুরন্দর তাঁর কবিতা পড়তে শুরু করলেন। আমি তো কবি নই, তা-ও ওই সময়ে যতখানি পেরেছি তাঁর কবিতা টুকে রাখার চেষ্টা করেছি। আমার লেখায় কবির কাব্যগুণ যথাযথ না এলেও তার ভাবটুকু আসবে। আমি তাই শোনাচ্ছি আপনাদের। কবি পড়লেন :

চন্দন চর্চিত তোমার আনন প্রিয়ে
অরণ্যের প্রায় কোনো অনন্য উপমা।
ক্লান্ত পথিক যেন হারিয়ে গিয়েছে কোনো আলোকিত দিনে
সে রহস্য তুমিই জেনেছ প্রিয়তমা।
আমরা পান্থশালে, নিতান্তই আশ্রিত জীব,
আমরা জানি না কেন তোমার প্রভঙ্গে কাঁদে মেঘ,
তোমাকে বাঁধার মতো কোনো রঞ্জু আমাদের নেই,
তোমাকে বন্দনা করে সেরকম কবিও চিনি না।
তোমাকে ব্যাখ্যা করে যারা
সে ফুল আজ ফোটে না এখানে;
তোমার গাছের মতো গাছেরাও বি
গত খরায় মারা গেছে।
আমরাই পড়ে আছি শুধু, তোমার পূজারি,

রাজকোষে নিয়মিত অর্থ দিয়ে যাই,
আমাদের পরিবারে নানা শোক,
সে তোমার না জানাই শ্রেয়।
তোমাকে যে চন্দ্র করে আলোকসম্পাত,
সে কেবল আমাদের উন্মাদই করে,
আমরা দুঃখী লোক দুঃখ দিয়ে তোমাকে গড়েছি।
তারপর বসে আছি রাজকীয় কোনো কালিদাস
এসে কবিতার তীব্র অসি হেনে
চিরে দেবে আমাদের বুক,
অশ্বপৃষ্ঠে তোমাকে বসিয়ে, নিয়ে যাবে অনেক সুদূরে।
আমাদের ভাগ্য প্রিয়ে এই,
চিরকালই ভাগ্য এই ছিল,
আমাদের মধ্যে কেউ কবি হতে চায়নি কখনো,
কালিদাস নামে কেউ বেশিদিন বাঁচে না এখানে।

পুরন্দরদাস এই কবিতা পড়তে পড়তে কাঁদছিলেন। কবিতা শুনতে শুনতে কাঁদছিল মাধবীও। আমি মূর্খ এই শব্দ টুকতে ঢুকতে ভাবের ঘরে ঢুকতেই পারিনি। অথচ নিয়মের খাতেই জিজ্ঞেস করে বসলাম, মাধবী, এই কবিতা তোমার কেমন লাগল? আর অমনি ভূতে পাওয়ার মতন মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের চুল ছিড়তে ছিড়তে মাধবী কান্না ধরল। এই সর্বনাশ তুমি আমার কেন করলে শৌনক? কেন তুমি আমার সঙ্গে শঠতা করলে? এরকম কবিতা আমি বাল্যে শুনেছি কবি বনমালীর কাছে। কেন তুমি আমার সেই হারানো স্মৃতি জাগাতে আজ এই কবিকে আনলে? ইনি তো আমায় নতুন কিছু শোনালেন না। আমি ভেবেছিলাম ইনি নারীর মধ্যে নারীর চেয়েও মহৎ কোনো সত্তার কথা বলবেন। সেরকম কবিতা আমি মাঝেমধ্যে স্বপ্নে শুনে

থাকি! যে কবিতার মাধ্যমে আমি আমার সমস্ত অতীতকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব, সেরকম একটা কবিতাও আমি লিখে ফেললে বনমালীর ওই শব্দের গহ্বর থেকে আমি নিষ্ক্রান্ত হতে পারব। শৌনক, তুমি জানো না আমি কী অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে কাল অতিবাহিত করছি। বনমালী আমাকে শুধু একটা নেশায় নিক্ষেপ করে গেছে। সেখান থেকে বার হবার পথ সে আমায় জানিয়ে যায়নি। আর একবারও যদি তার দেখা পেতাম। হায়, অভাগা আমি! আমার কবিতায় বনমালী যে কীরকম ঈশ্বরের মতোন অমোঘ তা যদি তাকে জানিয়ে দিতে পারতাম!

মাধবীর এই বিলাপ চলল বহুক্ষণ। পুরন্দর ঋদ্ধিযুক্ত মানুষ হলেও অন্য পুরুষের প্রশংসা বা কদর তাঁকে বিচলিত করে না। বিশেষত বনমালীর কদর তো নয়ই। শ্রাবন্তী থেকে উজ্জয়িনী আসার পথে তিনি আমায় বলেছিলেন যে, নারীর রহস্য সম্পর্কে মহাকবি অমরুর চেয়েও বনমালীর ভাবনা অনেক ক্ষেত্রে গভীর এবং আধুনিক। অথচ মাধবীর ব্যবহারে সেই পুরন্দরদাসও বেশ ভালোরকম অস্বস্তি বোধ করছিলেন। আমি নিজেও একটি বিশেষ অর্থে মাধবীর প্রণয়ী। আমি তাঁকে স্ত্রী করতে চাই না কিংবা শারীরিকভাবে পেতে চাই না। ওকে দূর থেকে একটা শিল্পের নমুনা হিসেবে দেখায় আমার বিপুল তৃপ্তি। যে আনন্দ আমি পেয়েছি উজ্জয়িনীর কোনো প্রস্তর মূর্তি দর্শন করে। কিংবা বিষণ্ণ সন্ধ্যাকালে শ্রাবন্তীর পার্শ্ববর্তী রেবা নদীর দিকে তাকিয়ে।

আমাদের দুজনের মনোভাব তখন কী করি? কী করি? অতঃপর আমিই বললাম মাধবীকে, তুমি যদি পিতার অনুমতি পাও আমি তোমাকে বনমালীর কাছে একটিবার নিয়ে যেতে পারি।

রাজাকে বোঝানো যে কী দারুণ কষ্টকর ব্যাপার ছিল তা আর না-ই বললাম। তাঁর একমাত্র কন্যা তায় অন্ধ এবং অসুস্থ, তাকে কিছুতেই তিনি

আমাদের সঙ্গে ছাড়তে রাজি নন। কিন্তু মাধবীও নাছোড়বান্দা। কবি পুরন্দরও তখন অনুমতির জন্য কাকুতিমিনতি করলেন। শেষে রাজি হওয়া সত্ত্বেও আমার অভিসন্ধির ওপর নজর রাখতে তিনি আমাদের সঙ্গে ভবতোষকেও পাঠালেন। রাজার ভাবনা হল যে, পুরো ব্যাপারটাই যদি বনমালীর একটা চক্রান্ত হয় তাহলে তাঁর পরমশত্রু ভবতোষ অন্তত তাঁর সাধের গুড়ে বালি দেবে। রাজার নিজেরও ভীষণ যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু শ্রাবন্তীর সঙ্গে ভরতপুরের সম্পর্ক ভালো নয় দেখে তিনি আর ওদিকে এগুলেন না।

আমরা যখন শ্রাবন্তীতে এসে হাজির হলাম মাধবী এক আশ্চর্য কথা বলে বসল। ওর ধারণা ও স্বপ্নে এই নগরীতে বিচরণ করেছে। চোখে দেখে না অথচ প্রতিটি অলিগলিই যেন তার চেনা। সহসা পালকিতে বসেই সে জিজ্ঞেস করল, এই নগরীর উত্তর-পশ্চিমে রেবা বলে নদী আছে না? আমি বললাম, হ্যাঁ—সেই নদীর পাড়ে যেখানে পুরবাসীরা স্নান করে সেখানে মাধবী নামে একটা গাছ আছে না?

আমি সে-বিষয়ে কিছুই জানতাম না, তাই পালকির বাহকদেরই জিজ্ঞেস করলাম। তারা তো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, আছে মহাজন! নিশ্চয়ই আছে। নগরীর মেয়েরা ওই গাছে নানান রকম মানত ঝুলিয়ে রাখে। কেউ কেউ বলে ওটা কোনো এক মহাকবি পুঁতে গিয়েছিলেন।

যখন মাধবীকে বললাম সেই কথা ও কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেল। তারপর যেন কোনো এক স্বপ্নের অতল থেকে আচ্ছন্নভাবে বলল, শৌনক, আমিই ওই গাছ।

৩.

মাধবী এবং বনমালীর সেই সাক্ষাতের দৃশ্য আমি বর্ণনা করার উপযুক্ত লোক নই। আমার কাষ্ঠশুষ্ক বিবরণে সেই মুহূর্তের তাৎপর্য কিছুতেই বোঝা যাবে না। মাধবীর দৃষ্টি নেই দেখে বনমালী চোখের জল সামলাতে পারলেন না। মাধবীর গন্ডদেশ থেকে অশ্রু মোছাতে মোছাতে কবি বললেন, মাধবী, কেন যে মানুষ কোনো কবিকে দ্রষ্টা বলে আমি জানি না। সে তো তার নিজের অধঃপতনও তার কবিতায় আঁচ করতে পারে না। তাহলে তোমার ...

কবিকে কথার মধ্যেই থামিয়ে দিল মাধবী। না, না কবি, আপনি কবিতাকে ছোটো করবেন। কবিতা যে কিছু দেয় না তা আমিও বুঝি। কিন্তু কবিতা যা দেয় তা তো কেউই বোঝে। আপনিই না আমায় বলেছিলেন একসময়, ব্রহ্মার সবচেয়ে বড় সৃষ্টি কবি কালিদাস! আপনিই না বলেছিলেন কবি ত্রিকালদ্রষ্টা! আপনিই প্রমাণ করেছিলেন যে হিমালয় পর্বতের অস্তিত্বের অতিরিক্ত সত্য নিহিত আছে কবি কালিদাসের হিমালয়ের বর্ণনায়? হিমালয় স্বয়ং যতখানি সত্য তার চেয়েও মহিয়ান কবির বর্ণনা—সেও তো আপনারই তত্ত্ব নয় কি!

এইভাবে ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছিল মাধবী। কিন্তু গোঁয়ার মানুষ বনমালীও। তিনি বললেন, আমি এখন বলছি কবিতা ছায়ামাত্র। কবিতা গোলকধাঁধা। কিন্তু আমার পূর্বের ধারণার গোলকধাঁধাও সে নয়। সে গোল নয়, সরল রেখামাত্র। এর কোনো আদি নেই, অন্ত নেই। সরল রেখার মতো ভীষণ গোলকধাঁধা আর কিছুই নেই। কেউ জানবেও না যে এই রেখা কোন বিন্দুতে বিদ্যমান। তাই আমি বলি কবিতা হল শেষমেষ এক অনন্ত নির্যাতন। এক অপরূপ সর্বনাশ।

কবিতার এই নিন্দে শুনতে শুনতে শিবনিন্দায় আর্ত সতীর মতন মাধবী ধীরে ধীরে স্তব্ধ হতে থাকল। তারপর মনের এক মোহাচ্ছন্ন পরিমন্ডল থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারণ করল :

পত্রমর্মরও তার বেদনা বোঝেনি,
যার বাস শ্রাবন্তীর সীমানা পেরিয়ে,
দিবসের প্রথম বিহঙ্গ তাকে দেখেছে ক্বচিৎ,
শোনায়নি গান তাকে বিহ্বল বাতাস।
আমি তার যাত্রাপথে থাকি, যদিও পিছিয়ে,
আমি দেখি গমনাগমন কত মানুষের
মৃত্যু ও শোকে।
আমি দেখি পশ্চিমা বায়ু
কীভাবে মত্ত করে বন,
কীভাবে পালিত পশু প্রাণপণ
ধরে রাখে নিজেদের প্রাণ!
মর্ত্যভূমি বড়োই কঠিন ঘর,
যাওয়া-আসা নিয়ত আছেই,
যারাই যত্নে বাঁধে সুখনীড়
তারাই ভাঙে তা কালে দু-হাতে।
সব শোকই যাত্রাপথে আছে
সব সুখই যাত্রা পথে রয়
যতদূর যাত্রা করা যায়।
তিনি আর কতদূর যান?
আমি আর কতখানি যাব?
এ তো শুধু যাওয়া, শুধু যাওয়া,
আমার হৃদয় শুধু পথ।।

তার উচ্চারণ শেষ হওয়ার পরও মাধবীর ঘোর কাটল না! অনুরূপ এক ঘোরের মধ্যে ছিলাম আমরাও। কবি বনমালীও বুঝলেন রাজকন্যার কী

সর্বনাশ তিনি করে দিয়েছেন। কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে তিনি কেবল নিজেকেই ধিক্কার দিতে থাকলেন। বললেন, মাধবী আমি পাষন্ড। আমি নরাধম। আমি কবিতার অনুপ্রেরণার জন্যই তোমাকে প্রতীক করে ব্যবহার করেছি। আমি তো তোমায় ভালোবাসিনি। আমি তো কাব্যের খাতিরে তোমার নাম, তোমার ব্যক্তিত্বের মূর্ছনাকে কাজে লাগিয়েছি। আমার কবিতার মাধবী আর তোমার জীবন্ত সত্তার মধ্যে তো দুস্তর ফারাক। তুমি জীবন্ত, তুমি ভগবানের সৃষ্টি। আমার কবিতার মাধবী তো ছায়া, একটা মানুষের কল্পনার পরিণতি। আমার কবিতার মাধ্যমে তুমি নিজের বিন্দুমাত্র সত্য দেখতে পাও না। তুমি ফিরে যাও। তুমি এই ভয়ংকর, মর্মান্তিক কল্পনার পথের যাত্রী হয়ো না মাধবী। তোমার তো সব আছে। যাদের কিছুই নেই সেই ভিখারিরাই এই কবিতার নকল জগতে আসে। যারা কিছুই পায়নি জীবনে তারাই শব্দের, ধ্বনির জগতে নকল রাজা সাজে। তারা যে নকল তারা তা নিজেও জানে না। আমি যে গাছটিকে মাধবী বলে স্নেহ করতাম সে তো কখনো মাধবী হবে না। তেমনি আমার কবিতা।

গাছের প্রসঙ্গ আসতে মাধবী ইশারা করে থামিয়ে দিল কবিকে। কবি, আপনি যে গাছটিকে মাধবী জ্ঞানে প্রণয় করতেন তাকে আমি শিল্পীর দ্বারা মাধবী করেই আমার কক্ষে রেখেছি। সেও আমার মতনই সত্য।

না, সে শুধু প্রতিকৃতিমাত্র। সে কখনো তুমি নও। কল্পনার তো শরীর হয় না।

কিন্তু আপনিই না বলেছিলেন শরীরের সত্য মুছে গেলেও কল্পনার সত্য জেগে থাকে।

তাহলে বলি। আমি রেবার পাড়েও একটি গাছকে মাধবী মনে করে স্নেহ করে থাকি। সেও কি মাধবী তাহলে?

হ্যাঁ, সেও মাধবী। যদি আপনার কল্পনায় প্রাণ থেকে থাকে, যদি আমার বাস্তব এবং আপনার কল্পনার পরমপ্রণয় থেকে থাকে।

মাধবীর এই কথা শোনামাত্র কবি বনমালী ত্রস্ত পায়ে রেবার কূলের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তাঁকে অনুসরণ করলাম আমি, মাধবী, পুরন্দরদাস এবং ভবতোষ। তখন বেলা পড়ে এসেছে। কূলে এসে সমস্ত বস্ত্র ছুড়ে ফেলে ঝাঁপ দিলেন জলে। একটু বাদেই ভেসে উঠে এক গলা জলে দাঁড়িয়ে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতাগুচ্ছ আবৃত্তি করতে লাগলেন। ক্রমে গোধূলির শেষ রশ্মিও বিলীন হল। নির্জন কূলে দাঁড়িয়ে তিনজন মন্ত্রমুগ্ধের মতন সেই অনির্বচনীয় কবিতা শুনতে থাকলাম। একসময় চন্দ্রোদয় হল! চন্দ্রের আলোকে উদ্ভাসিত হল কবির মুখ, কবির দেহ। তিনি যন্ত্র চালিতের মতন সমস্ত লাজ-লজ্জা ভুলে কূলে উঠে এলেন এবং পাড়ের গাছটির সঙ্গে সংগমে নিমগ্ন হলেন। আমরা স্তম্ভিত হলাম দেখে যে অদূরে রাজকন্যা মাধবীও তার সমস্ত বস্ত্র একে একে ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নিরাবরণ মাটিতে কাতরাতে লাগলেন। তার শরীরের ভাব দেখে মনে হল বুঝি বা কোনো অদৃশ্য প্রাণী তার সঙ্গে অলৌকিক এক রতিক্রীড়ায় মগ্ন হয়েছে। আমরা আরও আশ্চর্য হলাম দেখে যে, যে ভঙ্গিতে বনমালী গাছটিকে আকর্ষণ করছেন, তার শরীরে নিজেকে প্রয়োগ করছেন, তারই সংগতি যেন মাধবীর অঙ্গভঙ্গিতে!

আমি জানি না আমরা কতক্ষণ এই দৃশ্য দেখেছি। আমাদের বক্ষ বিদীর্ণ হয়েছে বেদনায় যখন আমরা দেখলাম একেবারে উন্মাদের মতন কবি বনমালী তাঁর গাছকে নিগ্রহ করছেন। তাঁর দুই হাতের পেষণে তখন বৃক্ষের সমস্ত শরীর যেন বাষ্পরুদ্ধ। যেন ছটফট করছে। আমরা দৌড়ে গেলাম তাঁকে বৃক্ষের থেকে আলাদা করে দিতে। কিন্তু হায় নিয়তি! ততক্ষণে অদূরে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেছে রাজকন্যা মাধবী। আমরা তার শরীরের পাশে গিয়ে দেখলাম তার কণ্ঠদেশে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে দশ আঙুলের দাগ।

আমি তার মাথার কাছে ঝুঁকে ডাকলাম, মাধবী! মাধবী! কিন্তু মাধবী তখন গাছ। কিংবা গাছের মতন।

এই তার শ্রেষ্ঠ সুযোগ বুঝে ভবতোষ 'খুন! খুন!' বলে চিৎকার করে নগরীর দিকে দৌড়োতে লাগল। তার জীবনের যা কিছু প্রাপ্য দাক্ষিণ্য তখন নির্ভর করছে বনমালীকে খুনি প্রমাণ করার মধ্যে। সেইসঙ্গে আমাকেও চক্রান্তের অংশীদার করায়। কারণ কোন সভা বিশ্বাস করবে মাধবীর অলৌকিক সংগম এবং মৃত্যুতে? আমার শুধু দুঃখ হয় হতভাগ্য ভবতোষ এই পরম অলৌকিক দৃশ্য দেখার পরও চরিত্রগতভাবে এতটুকু বদলাল না!

তাঁর জ্ঞান ফিরতে বনমালী যখন তাঁর সর্বনাশা কীর্তির কথা শুনলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ রেবার জলে ঝাঁপ দিলেন। আমি আর পুরন্দরদাস মাধবীর সৎকারটুকু শেষ করলাম রেবার তীরে। পুরন্দর অতঃপর তাঁর সমস্ত কবিতা জলে নিক্ষেপ করে মুনি মহাদিত্যের আশ্রমে ফিরে গেলেন। আর বেচারা আমি! আমি না ঘরের, না ঘাটের। আমি চিরকালের মতো

প্রবাসী হয়ে গেলাম। কারণ ভরতপুরে যাওয়া মানে শূলে চড়া। আমি এখন কোথায় যে যাব আমি নিজেও জানি না। আমার এই অভিজ্ঞতা আমি কাউকে কোনোদিন প্রাণ খুলে জানাতে পারব না। কারণ রাজার চর সর্বত্র। আমি আমার সাদামাটা ঢং-এ ভাবী কালের জন্য এই বিবরণ লিখে রেবার পাড়ে রোপণ করে যাচ্ছি। যদি কখনো কেউ এটি উদ্ধার করেন তবে তিনি যেন আমার ভাষা এবং ভাবের অক্ষমতাকে ক্ষমা করেন, ইচ্ছে মতন এই বিবরণকে আধুনিক ভাষায় জনগণের সামনে তুলে ধরেন। তবে অনুরোধ, এই ঘটনা এবং নামধাম যেন তিনি অবিকৃত রাখেন। এবং এই রচনার কৃতিত্বও যেন তিনিই নেন। আমি অখ্যাত অবলুপ্ত হয়ে থাকতে চাই।